# বাঙালীর হাজার বছর

জহর সরকার

**আনন্দবাজার পত্রিকা**, ১লা **জানুয়ারী ২০০০**

শতক-অন্ত তো এ বার সহস্রান্তিকও বটে! এ কথা ভাবলেই নিতান্ত নির্বিরোধী মানুষও ভেতরে ভেতরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করবেন। দুটো বিষয় নিশ্চয়ই সকলেরই মনে হবে. এক দিকে পিছন ফিরে চাওয়া-পাওয়ার সালতামামি; অন্য দিকে ভবিষ্যদর্শনের প্রয়াস, কী আছে ভাগ্যে। এ দেখা ব্যক্তিবিশেষ বা তার পরিপার্শ্ব ছাড়িয়ে বিস্তৃত হতে পারে তার অঞ্চল, রাজ্য, রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র মানবতা পর্যন্তও। আমার অবশ্য বাঙালি সমাজের বাইরে এই বিহঙ্গ দর্শন প্রসারিত করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি বা যোগাযোগ কোনওটাই নেই। সীমাবদ্ধতা আছে সেটুকুর মধ্যেও। তবু এ নিয়ে একটা আড্ডা শুরু করার লোভও সামলাতে পারছি না। অবশ্য দু-চার পাতায় হাজার বছরের কথা আলোচনার ঔদ্ধত্য আমার নেই। কোন দিক থেকে দেখতে চাই, সেটা বোঝাতে আমি শুধু কয়েকটা বিশেষ যুগ বা নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের কথাই তুলবো।

প্রথমেই দেখা যাক, বাঙালির বয়স কি হাজার বছর? নাকি আরও বেশি? পাল-সেন যুগে বাঙালির ইতিহাসের কথা ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তাতে আমরা অন্তত ১২৫০ বছরের জন্য গর্ব করতেই পারি। শশাঙ্ককে ধরলে এটা পৌঁছবে ১৪০০ বছরে। সেখানেই বা থামি কেন? বিজয়সিংহ আর তাঁর সিংহল বিজয় কবে ঘটেছিলো কে জানে, তবু ছোটবেলা থেকেই সে কাহিনী এত বার শোনা যে তাকে বাদ দিতে মন চায় না। আবার প্রত্নতাত্ত্বিকদের কথায় একটু গুরুত্ব দিলে নির্দ্বিধায় বলা যাবে বীরভানপুর আর পাণ্ডুরাজার ঢিবির নব্য ও তাম্রপ্রস্তর যুগের অধিবাসীরা বাঙালিই ছিলেন। শুশুনিয়ার পুরাপ্রস্তর যুগের বসতি আর পশ্চিম রাঢ়-এর বহু প্রত্নক্ষেত্রের আদিম অধিবাসীদের আপন ভেবে নিলে বাঙালির ইতিহাসকে অনায়াসে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছরে ঠেলে দেওয়া যায়। তাতে অবশ্য মাঝের অজানা শতাব্দীগুলিকে বেমালুম ভুলে যেতে হবে। এ দিকে ভাষাবিদরা দেখিয়েছেন, লাঙ্গল, নারিকেল, তাম্বুল, হরিদ্রা-র মতো গুরুত্বপূর্ণ বাঙলা শব্দ অস্ট্রিক উৎসজাত। তা হলে তো আমরা তাদের উত্তরাধিকারও দাবি করতে পারি (নাকি করবো না, কারণ অস্ট্রিকরা ভীষণ কালো!)। কিন্তু জন্ম থেকেই যে শুনে আসছি আমরা আর্য, যদিও আমাদের মধ্যে অধিকাংশই (খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখুন) নিছক 'শ্যামবর্ণ'। কবিগুরু এই দেখেই লিখেছিলেন, "মক্ষমূলর বলেছে আর্য / তাই শুনে মোরা ছেড়েছি কার্য।"

কাজের কোথায় ফেরা যাক। আমাদের আসল প্রশ্নের উত্তর বোধহয় নির্ভর করবে আর একটা প্রশ্নের উপর: বাঙালি বলতে কী বোঝায়? ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক বিবেচনায় কয়েক শতাব্দী আগেও যে 'বাংলা' নামক কোনও নির্দিষ্ট ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না, সে বিতর্কে আমরা আর এখানে ঢুকছি না. ধরে নেওয়া যাক, আমাদের আলোচ্য 'বাংলা' বলতে পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল — এই প্রাচীন ভূখণ্ডের এই সব বিভিন্ন বিভাগকেই বোঝাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাঙালির প্রাচীনত্ব নির্ধারণে একটি মাপকাঠি স্থির করা দরকার। ভূগোল বা রাজনীতির দিক থেকে বিবেচনা না করে যদি বাঙালিদের একটি ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে দেখি, তা হলে অবশ্য শশাঙ্ক বা পাল-সেন রাজাদের বাদ দিতে হয়। কারণ তাঁরা না লিখেছেন বাংলা ভাষায়, না দিয়েছেন তার জন্য কোনও পৃষ্ঠপোষণা। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন তা বাংলার আদিরূপ কি না আমরা জানি না। আমার মনে হয়, বাংলা ভাষা বলতে আজ যা বুঝি, পাল-সেন যুগেই তা শৈশব

কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো। সাধারণ মানুষ, অন্তত রাঢ় অঞ্চলে, যে ভাষায় কথা বলতেন তার ঝোঁকটা বাংলার দিকেই ছিল। 'চর্যাপদ' থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু অন্য ধরণের শব্দ এতো বেশি যে তাকে বাংলা বলা মুশকিল। চর্যাপদকে অবশ্য বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব বলে চিহ্নিত করাটাই রীতি, কারণ তাতে ন'শো থেকে হাজার বছরের ঐতিহ্য খাড়া করা যায়। অথচ শ'খানেক বছর আগে নেপালে আকস্মিকভাবে খুঁজে পাওয়া অবধি এর কথা আমরা জানতামই না। ব্যাকরণ, বাকরীতি, বাক্য গঠন, এই সব ক্ষেত্রে চর্যার বাঙালি চরিত্র স্পষ্ট হলেও এর ভাষাকে বাংলা বলা যায় না। বাংলা তখনও অপভ্রংশ থেকে লৌকিক অবহট্ট হয়ে প্রকৃত রূপ পায়নি। ফলে 'বাঙালির' বয়স বিচারে প্রাচীনতম পুঁথিপত্র আর অকাট্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করাই ভালো।

বাংলা, বাংলা লিপি, বাংলা ভাষা, আর বাঙালি। শত শত বছর ধরে এই শব্দগুলি গড়ে উঠেছে, কখনও আলাদা ভাবে, কখনও এক যোগে। সবে চৌদ্দ শতকের কোনও সময় সব মিলেমিশে এক হয়ে সংহত চরিত্র পেল। তা হলে, হাজার বছরের কথা ওঠে কি করে? কারণ একটাই, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে, বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, বাংলা লিপিতে লিখে বাঙালিরা এক দিনে পৃথক গোষ্ঠীর চরিত্র পায়নি, এর মধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে অনেক শতাব্দী। পোশাক-আশাক, বৈশিষ্ট্য, বাকরীতি, খাবার-দাবার, অন্যান্য অভ্যাসে আজকের জায়গায় পৌঁছতেও লেগেছে বেশ কয়েক শতাব্দী। এ সব এখনো প্রত্যেক প্রজন্মের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে, যদিও আদত বাঙালিয়ানার সঙ্গে যোগসূত্র মোটের উপর অটুটই আছে।

বাংলা লিপির কথাই ধরা যাক। অশোকের লিপির ব্রাহ্মী (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) থেকে কুমারগুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসন (৪৩২ খ্রিস্টাব্দ), পাল রাজাদের খালিমপুর (অষ্টম শতকের শেষপর্ব) ও বাণগড় (দশম শতকের শেষপর্ব) লিপি হয়ে লক্ষণসেনের তর্পণদীঘি ভূমিদানপত্র এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে 'যোগরত্নমালা' ও 'পঞ্চরক্ষা'র কেমব্রিজ পুঁথিতে 'পূর্ণাঙ্গ রূপ' (সুকুমার সেনের ভাষায়) পেতে লেগে গেলো প্রায় দেড় হাজার বছর। তবে পন্ডিতরা সবাই অবশ্য এত পিছোতে রাজি নন। যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন বাংলা বর্ণমালা পঞ্চদশ শতকের আগে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, "ই, চ এবং ন-এর মতো কয়েকটি অক্ষরের চূড়ান্ত রূপ নজরে পড়ে কেবলমাত্র মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকালে।" দেবতার কাছে মানত করে দেওয়া পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ লেখ থেকে ভাষা ও লিপির বিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা অনেক সময়েই বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতদের থেকে আলাদা রাস্তা নিয়েছেন। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রত্নসমীক্ষা'য় এ ধরণের লেখমালা নিয়ে গবেষণা করে সহস্রাব্দের প্রথম চার শতকে সাধারণ বাঙালির আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাঙালি সভ্যতা গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষের অবদানই সব থেকে বেশি ছিল।

মুসলমান বিজয়ের অভিঘাতে সাহিত্যের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং শ্রীচৈতন্যের নব্য-বৈষ্ণববাদ এসে তাকে উদ্ধার করলো — এ কথা মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞই। গোবিন্দদাস, বৃন্দাবনদাস, জয়াচন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং লোচনদাসের মতো ষোড়শো শতকের গৌড়ীয় জীবনীকারদের রচনা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ (যদিও রচনার মান সকলের সমান নয়), কিন্তু পথিকৃৎদের নির্বিচারে অগ্রাহ্য করাটাও কি খুব যুক্তিযুক্ত? যেমন, ১৪৭০-৮০-র কথাই ধরা যাক। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' আর বাংলায় 'ভাগবত' এই সময়ই রচিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আরও কয়েক বছর পরে লেখা হয়ে থাকতে পারে, যদিও কেউ কেউ মনে করেন তা আরও আগে লেখা। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের আংশিক অনুবাদ ষোড়শো শতকের গোড়ার ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কে (বড়ু অথবা দ্বিজ যাঁরই হোক) এই সময়ের একেক

দশকে ফেলতে চেয়েছেন একেক জন গবেষক। এই রচনার কাহিনী প্রাচীনতর, তবে ভাষা ষোড়শো শতকের সূচনাপর্বের — এ কথা অবশ্য অনেকেই মেনে নিয়েছেন। এ থেকে কি এটাই দাঁড়াচ্ছে যে বাংলা সাহিত্য মাত্র পাঁচশো বছরের কিছু বেশি পুরোনো? বাংলা বলে চেনা যায় এমন ভাষায় এবং বঙ্গাক্ষরে লেখা এর আগের কোনও পুঁথি আবিষ্কার না হওয়া অবধি বাংলা সাহিত্যকে মধ্য-পঞ্চদশ শতকের আগে ঠেলে দেওয়ার মতো প্রমাণ সত্যিই আমাদের হাতে নেই। (চর্যাপদের 'আজি ভুসুক বঙ্গালী হইলি'-র মতো বিক্ষিপ্ত দু'একটি উদাহরণ এখানে বিবেচনা করছি না।) সব ভাষাতেই কথ্য রূপ লিখিত রূপের তুলনায় এক বা একাধিক শতক এগিয়ে থাকে, ফলে বাঙালি সত্তার গড়ে ওঠাকে মোটের উপর উত্তর-চর্যাপদ বা উত্তর-সেন যুগে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ আর চতুর্দশ শতকে স্থাপন করা যেতে পারে।

কিন্তু ১২০২-০৪ নাগাদ ইসলামের বঙ্গবিজয়ের পরবর্তী তিনশো বছরকে পণ্ডিতরা কি এতো কাল ধরে 'অন্ধকার যুগ' বলে আসেননি? এই তিন শতকের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের কোনও স্পষ্ট ছবি আমাদের হাতে না থাকলেও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ তো আগের যুগের তুলনায় অনেকটাই লভ্য। তা হলে একে 'অন্ধকার যুগ' বলে হয় কেন? কারণ সাহিত্যকর্মের কোনও নিদর্শন নেই; সাংস্কৃতিক কাজকর্মে কোনও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণার খবর নেই; কোনও মন্দির তৈরি হয়নি; খোদিত লিপি বা ভূমিদানপত্র পাওয়া যায় না বললেই চলে; ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে, বহিরাগত 'যবন'রা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষণা প্রত্যাহার করে নিল বলেই (পূর্ববর্তী সেন যুগে যা ছিল অকৃপণ) এই যুগকে 'অন্ধকার' বলা হয়। অথচ সেন রাজারাও তো বহিরাগত, তাঁরা কর্ণাটক থেকে এসেছিলেন! আবার বাংলার 'খাঁটি' ব্রাহ্মণরা তো এই সে দিন পর্যন্তও লিখতেন - কথা বলতেন সংস্কৃতে, আমজনতার ভাষা নিয়ে পোষণ করতেন তীব্র অশ্রদ্ধা। তা হলে এটা কী আশা করা যায় যে তুর্কি-পাঠানরা 'বিধর্মী'দের মদত দেবে? বহিরাগত সেন রাজারা যে সাড়ে তিনশো বছরের পাল রাজত্বের সমদর্শী সংস্কৃতি ও প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটিয়েছেন, আর মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন উত্তর-ভারতীয় 'সংস্কৃত'তন্ত্র, তার বেলা 'অন্ধকার যুগ'-এর প্রবক্তারা কী বলেন? তা ছাড়া, তিন শতক বলাও ঠিক নয়, এটা আসলে দুশো বছর। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করতে পারলে হয়তো এই সময় আরও কমিয়ে আনা যাবে। তা ছাড়া হাতে যে সব তথ্য আছে, তাও খোলা মনে নতুন করে খতিয়ে দেখলে হয়ত 'শূন্য পুরাণ'-কে ত্রয়োদশ শতকের রচনা বলেই ধরতে হবে, অবশ্যই পরবর্তী সংযোজন বাদ দিয়ে।

প্রথমে 'অন্ধকার যুগ'-এর সময়সীমাটা কমিয়ে আনা যাক। ১৪৭০-এর আগে সাহিত্যে বাঙালিত্বের প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু সাক্ষ্য রয়েছে। তুর্কি-পাঠান শাসকশ্রেণীর সঙ্গে হিন্দু বাঙালি উচ্চবর্ণের সম্পর্ক কী ছিল, বিশেষ করে গৌড়-বরেন্দ্রী অঞ্চলে যেখানে ইসলামের প্রথম ঘাঁটি, তা এখনও ধোঁয়াটে। লোককাহিনীতে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা পাওয়া যায়, তা প্রমাণ বা অপ্রমাণের জন্য আরও মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন। ১৩৯৭-এ আমরা দেখি ফিরদৌসি সুফি সন্ত মৌলানা মুজাফ্ফর শামস বলখি সুলতানের কাছে অভিযোগ করছেন, 'পরাজিত অবিশ্বাসীরা নিজেদের এলাকা শাসন করতে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করছে', আর 'ইসলামের এলাকায় মুসলমানদের উপর দায়িত্বপূর্ণ পদে তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে'। রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন, চতুর্দশ শতকের শেষ পর্বের এই সব ঘটনা থেকে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় দুই সম্প্রদায়ের অভিজাতদের মধ্যে বিরোধ বাড়তেই থাকে। এরই ফল হলো রাজা গনেশের অভ্যুত্থান এবং পরে যদু-জালালুদ্দিন হিসাবে তাঁর ছেলের বাংলার মসনদে আরোহণ। আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়, জালালুদ্দিন যদিও নির্ভেজাল মুসলিম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি, তবু চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান তাঁর রাজ্যে সবাইকে বাংলায় কথাবার্তা বলতেই দেখেছিলেন, অবশ্য কোনও কোনও সভাসদ ফার্সি বুঝতেন।

জালালের মুদ্রায় আছে অ-ইসলামি সিংহের প্রতীক, যে কিনা চন্ডী-দুর্গার বাহন! আবার পাণ্ডুয়ায় তাঁর একলাখি সমাধিভবনের স্থাপত্যরীতি, টেরাকোটা অলঙ্করণ ও প্রতীকের ব্যবহারে ইসলামের থেকে বাঙালি চরিত্র বেশি স্পষ্ট। বস্তুত এটিকে বাঙালি ইসলামী স্থাপত্যের আদর্শ বলা যায়। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সব কিছু তত অন্ধকার ছিল না, আর বাঙালি সত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠাও ঘটছিল যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে। ইলিয়াসশাহী জমানাতেও এই ধারার অবলুপ্তি ঘটেনি। বরং সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪) যশোরাজ এবং মালাধর বসুর রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, শেষের জনকে তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধিও দিয়েছিলেন। উদ্বেল চৈতন্যযুগে, ১৪৯৩ থেকে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শাসনকর্তা ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ আর নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহ, তাঁদের অবদানের কথা এতটাই সর্বজনস্বীকৃত যে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

এ বার আমরা চেনা জমিতে পৌঁছেছি। এখন দেখা যেতে পারে সুচিহ্নিত লিপি, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের সমবায়ে গড়া সর্বজনীন ভাষা ছাড়া 'সত্তা' বলতে কী বোঝায়। ইজরায়েলীরা দেখিয়ে দিয়েছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা সব সময় জরুরি নয়, তাদের কাছে এক সর্বজনীন ধর্ম ও ভাষাই যথেষ্ট। আমাদের কাছে সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে 'এক ভাষা', তবে বহুব্যাপ্ত তথা মোটের উপর একই ধরণের সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্মের জন্যই এসেছে বৈচিত্র। কিন্তু নিজস্ব পরিচয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল তার গ্রহণীয়তা; এই মাপকাঠিতেই সহজে বিচার করা যায় কে বাঙালি আর কে নয়। এই পরিচয় যে মেনে নেয় এবং অনেক সময় গর্ব করেই সে কথা বলে, সে-ই বাঙালি। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। মানসিংহের সময় মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এলাকায় যে রাজস্থানি জৈনরা বসতি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমলরা অনেকেই পরে নিজেদের বাঙালি বলে মেনে নিয়েছেন; বাকিদের অধিকাংশ, দুধরিয়া, বাচাওয়াত, সিংহী, নাহার, দুগার, নওলাখারা তা করেননি, যদিও প্রায় সকলেই চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। এঁদের তাই বাঙালি বলা যাবে না। পুরুলিয়ার তামিল আয়েঙ্গারদেরও একই ব্যাপার। বাসুদেব আচারিয়ার মতো তাঁদের কাউকে কাউকে বাঙালিদের থেকে আলাদা করা যায় না, আবার অন্যরা পুরোনো সংস্কৃতি ধরে রেখেছেন, খাঁটি আয়েঙ্গার পাত্র-পাত্রী খুঁজতে যান অন্য রাজ্য থেকে। বর্ধমানের পঞ্জাবি রাজপরিবার কখনোই নিজেদের পুরোপুরি বাঙালি বলে মনে করেননি, যদিও এ রাজ্যে তাঁদের অবদান বড় কম নয়। অথচ তাঁদের অনুগামী ক্ষত্রীরা, যাঁরা এক সময় বাংলা ভাষা বললেও অন্য রাজ্যে বিয়ে-থা করতেন, গত কয়েক দশকে এ ব্যাপারেও বাঙালি হয়ে পড়েছেন। পুরোনো মালদহের আগরওয়ালারা এখন এতটাই বাঙালি যে তাঁদের আর মাড়োয়ারি বলা কঠিন। এমন উদাহরণ অনেক আছে। বহু পাণ্ডে, ত্রিবেদী, ঝা/ওঝা, মিশির/মিশ্র, শুকুল/শুক্ল, রাজপুত, সিংহ আর অন্যান্য স্পষ্ট 'বহিরাগত'রা বাংলা ও বাংলা সাহিত্যকে এতটাই সমৃদ্ধ করেছেন যে তাঁদের 'বাঙালি' বলতে আমাদের গর্ব হয়। সব পরিচয়ই আসলে যেহেতু 'সামাজিক নির্মাণ', ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আচার-আচরণ আর ভূমিকা-পালন তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অন্য দিকে তিনটি গোষ্ঠীর কথা বলা প্রয়োজন যারা এই প্রদেশে সংস্কৃতির বাঙালীকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছিল — এক দল সংস্কৃতবাদী ব্রাহ্মণ, মুসলিম 'আশরাফ' আর কট্টর ইংরেজভক্ত। তাঁদের সমস্যাও পরিচয়কেন্দ্রিক — তাঁদের অনেকেরই স্থির বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা 'উন্নত' সংস্কৃতির মানুষ, এবং সন্তর্পণে 'নেটিভ'দের সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতেন। 'ব্রাহ্মণ' বলতে অবশ্য এখানে বাংলার তথাকথিত দুটি কুলীন উচ্চবর্ণকে বোঝানো হচ্ছে — যাঁদের অনেকেই উত্তরভারতীয় বংশপরিচয় তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন বা তার উপর গুরুত্ব দিতেন, আর সেই জন্য মূলস্রোত থেকে দূরে থাকতেন (তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস গ্রন্থগুলি ঘাঁটলেই এ কথা স্পষ্ট হবে)। সব ব্রাহ্মণরা অবশ্য বাংলার বিরোধিতা করেননি, গ্রামের ব্রাহ্মণেরা গোড়া থেকেই বাংলা সাহিত্যের পুরোভাগে ছিলেন। কখনও অনিচ্ছায় বাংলাকে মেনে নিলেও সংস্কৃতবাদীরা ভাষায়

অপ্রয়োজনীয় ও জটিল সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, যেমন আশরাফ এবং ইংরেজভক্তরা চেয়েছেন যথাক্রমে অপ্রচলিত উর্দু-ফার্সি ও ইংরাজি শব্দ ঢোকাতে। এই সব ভাষার সঙ্গে সহবাসে বাংলা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের আপত্তি সাংস্কৃতিক উচ্চমন্যজাত মনোভঙ্গি ও জীবনচর্যায়। আমাদের নড়-নাদির 'সভ্য' নামগুলি আমরা 'বিকৃত' করেছি, এই যুক্তিতে চলিত কাঁসাই, শিলাই, নোয়াই কি সোনাই-এর বদলে সংস্কৃতায়িত কংসাবতী, শিলাবতী, লাবণ্যবতী বা সুবর্ণবতী নাম আমরা কেন মেনে নেবো এটা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমি বহুবার ভাষাতাত্বিকদের জিজ্ঞাসা করেছি, অন্ত্যপদ 'বতী' কী ভাবে 'আই' হয়ে যেতে পারে, কারণ যুক্তি মানলে 'বতী' — 'বই' — 'ওই' হওয়া উচিত, 'আই' নয়। এই ধরণের সংস্কৃতায়ন কী 'মিডনাপোর' বা 'বার্ডোয়ান'-এর মতো স্থাননামের ইংরেজিকরণের সঙ্গে তুলনীয় অপকীর্তি নয়?

এ বার ভাষা ও সাহিত্য ছেড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালিত্বের অনুসন্ধান করা যাক। আমাদের ঐতিহ্যগত পোশাক-পরিচ্ছদ বিশেষ বদলায়নি, শুধু আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি আর পাজামায় মুসলিম ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে অপ্রতিরোধ্য পশ্চিমায়ন সত্ত্বেও যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে সাধারণ বাঙালি অনায়াসে অফিস-পোশাক থেকে ঐতিহ্যসম্মাত পরিচ্ছদে নিজেকে বদলে নিতে পারে। অন্য অনেক রাজ্যের মানুষের চেয়ে বাঙালি ধুতি-পাঞ্জাবি পড়তে গর্ববোধ করে। ইসলামি ধর্মীয় স্থাপত্যে বাংলা রীতির স্পষ্ট ছাপের কথা আগেই বলা হয়েছে। ষোড়শো শতকের প্রথম দশকে তৈরি গৌড়ের লোটন মসজিদ বাঙালি ইসলামি স্থাপত্যের আর এক চমৎকার উদাহরণ — যা পরে বহু স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সারা বাংলায় কোথায় কোথায় এই ধরণের স্থাপত্য আছে তা নিয়ে কোনও সার্বিক সমীক্ষা হয়নি, যা কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ক্ষেত্রে হয়েছে। পরভিন হাসান মনে করেন, পঞ্চদশ শতকে ইটের বর্গাকার মসজিদ নির্মাণধারার সূচনায় বাংলার বৌদ্ধ মন্দির স্থাপত্যরীতির প্রত্যক্ষ প্রমান রয়েছে। আবার আহমদ হাসান দানির মতে, বাংলার মসজিদের নাতিবঙ্কিম কার্নিশ আসলে বাঁশ-খড়ের কুঁড়েঘর থেকেই এসেছে, যে কুঁড়েঘর এখনও এখানে সর্বত্র দেখা যায়। দানির কথায়, 'বাংলা চলার মোটিফ বাংলার স্থাপত্যে অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে ওঠে, তা সে সরকারি বা বেসরকারি, হিন্দু বা মুসলিম যা-ই হোক না কেন।' বাংলা থেকে এলো 'বাংলো', ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যে এই প্রদেশের স্থায়ী অবদান।

এখন মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে, বাঙালির সাংস্কৃতিক চরিত্র প্রথম চতুর্দশ শতক থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করে। ষোড়শো শতকের মধ্যেই তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে — তা হিন্দু-মুসলিম যাই হোক না কেন। কিন্তু বৌদ্ধদের কী হলো? এখানে সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, নিজেদের 'অবক্ষয়', সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষণায় ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান এবং ইসলামের হাতে বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষুদের বিনাশের ফলেই বৌদ্ধধর্ম বঙ্গভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ত্রয়োদশ শতকেই। তাই যদি হবে, তা হলে বৈষ্ণবরা ষোড়শো আর সপ্তদশ শতকে 'সহজিয়া' আর 'নেড়ানেড়ি'র মতো অজস্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে কী করে নিজেদের প্রভাব-পরিমণ্ডলে নিয়ে এলো? মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধদের বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্যই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সব বাঙালি মুসলমানকেই 'নেড়ে' অভিধা দেন — এই তত্ত্বও দিয়েছেন পন্ডিতরা। ১৮৯৪-৯৫-তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন বললেন, বাংলার 'ধর্মঠাকুর উপাসনা' আসলে 'জীবন্ত বৌদ্ধধর্ম', তখন যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। একের পর এক পন্ডিত এর বিরুদ্ধে আক্রমণ বানালেন — শাস্ত্রীর বক্তব্যে নাকি তথ্যের থেকে আবেগ বেশি। অন্তত পাঁচশো বছরের বৌদ্ধ সংস্কৃতির দান এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না — হিন্দু ও মুসলিমরা অধিকাংশ বৌদ্ধকেন্দ্রের দখল নিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও। বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর হয়েছেন 'লোকেশ্বর শিব' (না বিষ্ণু?), তারা আর বাশুলি পরিণত হয়েছেন হিন্দু দেবীতে। বহু বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবী মূর্তি আমাদের মন্দিরে মন্দিরে অন্য নামে উপাসিত — অনেক সময়েই কাপড় বা তেল-সিঁদুরে প্রতিমালক্ষণ আবৃত বা বিলুপ্ত। পাঁচথুপি (পঞ্চস্তুপিকা), বাজাসন

(বজ্রাসন), বা ধামরাই (ধর্মরাজিকা)-এর মতো বাংলা স্থান নামে বৌদ্ধ ঐতিহ্য পরিস্ফুটো — সর্বত্র পাওয়া বুদ্ধমূর্তির খণ্ডিত মস্তক বা বহু ব্যবহৃত বাংলা শব্দ 'স্তূপাকার' এবং 'ধ্বংসস্তূপ'-এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই ঐতিহ্য ধ্বংসের ইতিহাস। আমাদের লক্ষণীয় বিষয়, বাংলার সমদর্শিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য এই কয়েক শতাব্দীব্যাপী বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ দান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত মানি বা নাই মানি, এটা ঠিকই যে ধর্ম, মনসা এবং নাথ-এর মতো বাংলার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লোকধর্মে একই ধাঁচের সৃষ্টিতত্ত্ব দেখা যায়, যার কেন্দ্রে আছেন আদিদেব ধর্ম। এই দেবতাকে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর তিন সৃষ্টি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রচারিত বৌদ্ধ কাহিনীগুলির মতোই এখানে সংস্কৃত-বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। সুকুমার সেন ও অন্য পণ্ডিতরা বলেছেন, ইসলামের বঙ্গবিজয়-পরবর্তী 'অন্ধকার' যুগে এই সব লোকধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিলো, যদিও মঙ্গলকাব্যের পুঁথিতে তাদের কাব্য রূপায়ণ হতে সময় লেগেছিল অনেক বেশি। বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' (১৪০৩) এবং বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' (১৪৯৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের পূর্ববর্তী হলেও মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ পুঁথিই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর। চৈতন্য তথা বৈষ্ণবকূল বাংলায় বিপ্লবাত্মক চিন্তা ভাবনা এনে এবং চমৎকার সাহিত্য রচনা করে এতটাই ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন যে উচ্চ বর্ণের কবিরা আত্মসাৎ করে নেওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্য বিশেষ গুরুত্বই পায়নি। মনসা মঙ্গলের কবিদের সারা বাংলা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা মূলত পশ্চিম রাঢ়-এর মানুষ। 'জাগরণ' গান হিসেবে মঙ্গলকাব্যের যে কাহিনী যুগ যুগ ধরে রাতের পর রাট মানুষকে আপ্লুত রেখেছে, তার ঘটনাস্থলও গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ় এলাকা। এই সব জনপ্রিয় লোকগাঁথায় তিনটি বক্তব্য খুব স্পষ্ট। প্রথমত, দেবতা/দেবীকে অবহেলা করে বিপদ ডেকে আনা, কিংবা উপাসনা করে সমৃদ্ধ হও; দ্বিতীয়ত, এই সব এতাবৎ 'অন্ত্যজ' ও 'ব্রাত্য' বলে পরিচিত জনগোষ্ঠীর দেবদেবীরা এখন হিন্দু দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, আর তৃতীয়ত, অনেক চেষ্টার পর হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যোগসূত্র রচিত হয়ে যাওয়ার দরুন এ বার ব্রাহ্মণরাও বিধিসম্মত ভাবেই এই দেবদেবীদের পূজার্চনা করতে পারেন। দ্বাদশ শতকে 'ব্রহ্মবৈবর্ত' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' দিয়ে সংস্কৃত ঐতিহ্যের আমন্ত্রিত ধ্বজাধারীরা যে 'মানিয়ে নেওয়া'র প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, এত দিনে 'লোকায়ন'-এ তা পূর্ণতা পেলো (বিনয় সরকারের ভাষায়, 'আরিয়ানাইজেশন'-এর বদলে হল 'পারিয়ানাইজেশন')। এতে হিন্দুদের তাৎক্ষণিক লাভের লাভ বলতে নিম্নতম শ্রেণীকে আকর্ষণ করার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের স্রোতকে রোখারও উপায় হল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও লোকগাথা ছিল, যেমন ময়নামতির গান, গোপীচন্দ্রের গান বা ময়মনসিংহ গীতিকা — কিন্তু এর কোনোটিতেই হিন্দু ধর্মের বার্তা এতো দৃপ্ত হয়ে ওঠে নি। এ থেকেই বোঝা যায় কেন শুধু বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ নতুন হিন্দুধর্মের জয়গান গেয়েছিল, কেন ১৮৭২-এর জনগণনায় শুধু বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলি আর চব্বিশ পরগনায় হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল, যেখানে ভাগীরথীর পূর্ব তীরের সব জেলায় চিত্র ছিল বিপরীত!

মঙ্গলকাব্যের পাতায় আমরা প্রায়শই এমন সমাজের দেখা পাই, যেখানে মানুষ শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ করে বাঁচে কিংবা পশুপালন যাদের জীবিকা। কালকেতুর প্রথম জীবনের কাহিনী স্মরণ করুন, কিংবা মনসা ও রাখালদের উপাখ্যান। আবার, সেই সমাজের দ্রুত কৃষিজীবী হয়ে ওঠার সংকেতও মঙ্গলকাব্যে আছে। কিন্তু সেখানে স্তরে স্তরে যে সব বিবরণ রয়েছে, যার কিছুটা বাস্তব, বাকিটা নয়, এবং যে বিবরণ কবি কল্পনার চোরাবালিতে নিমগ্ন, ঐতিহাসিক তা নিয়ে কাজ করতে একেবারেই ভরসা পান না। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর প্রাথমিক সাহসী উদ্যোগের কথা মনে রেখেই এটা বলছি। রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন, পূর্ব বঙ্গে

নতুন কৃষক সমাজের বিস্তারের সঙ্গে ইসলামের প্রসারের যোগসূত্র আছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় আমি যে গবেষণা করেছি তা থেকে আমার মনে হয়, ওই অঞ্চলে ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটেছিল। এখানে কতকগুলি জিনিস হাত মিলিয়ে কাজ করছিল — বৈষ্ণবদের উদারনীতি, মঙ্গলকাব্য এবং আমি যাকে বলি শিবায়নীকরণ। শেষোক্ত ধারণাটির ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে এই অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া ভালো। কিছু কিছু প্রমান দেখে মনে হয়, মধ্যযুগের গোড়ার দিক থেকে মাঝবরাবর ল্যাটেরাইট শুস্ক ভূমি, শালের জঙ্গল এবং রাঢ়-এর নদীবিধৌত জলাভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষবাস আস্তে আস্তে বাড়ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বের আগে অবশ্য সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, যে কারণে ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের নাম দেয় 'জঙ্গল মহল'। এই অঞ্চলে ভূমিপুত্রদের বিরাট গোষ্ঠী বসতি করেছিল, প্রায়শই ওড়িশার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই সব 'ভূম'-এর নেতারা অচিরেই 'রাজপূত' হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন, পরিবার-প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে একই ধরণের উপকথা প্রচলিত হল যে, রাজপুতানা থেকে পুরী যাওয়ার পথে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে জন্মের পর বাবা তাঁকে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মন্দির নির্মাণের কর্মকাণ্ড বাংলার শুদ্রদের একটা স্বীকৃতি দিয়েছিল, যে স্বীকৃতির ভিত্তি ছিল ধর্মীয় মর্যাদা। এই স্বীকৃতির বলে শূদ্ররা সমাজকাঠামোর নিচের স্তর থেকে উপরে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। খনার বচন এবং শিবায়নের মতো কৃষিকাজ বিষয়ক প্রবচনমালা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে বোঝা যায়, কৈলাসের শক্তিমান শিব কী ভাবে বাঙালির কৃষকে 'বাম-ভোলা'য় রূপান্তরিত হলেন। যুদ্ধের দেবী সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী চণ্ডী দুর্গা থেকে বাঙালির আদরের কন্যা দেবীতে রূপান্তর, দেবী থেকে মানুষীতে উত্তরণও এই একই ধারার অনুসারী, যে ধারাকে আমি শিবায়নীকরণ বলতে চাইছি।

ইতিহাসের আলোয় বাঙালি চরিত্রের নানা দিক পর্যালোচনার পরে আবার আমরা রাজনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। বাংলার শেষ আফগান শাসক আকবরের কাছে পরাজয় মানলেন, সেটা ১৫৭৫ সাল। 'দুর্ধর্ষ বারো ভূইঁয়া'র বিক্রমের প্রচলিত কাহিনীকে যদুনাথ সরকার 'অলীক প্রাদেশিক দেশপ্রেম' বলে নস্যাৎ করেছেন, বলেছেন, ''আমাদের নাট্যকাররা যখন প্রতাপাদিত্যকে মহরানা প্রতাপের সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেন, তার চেয়ে উদ্ভট আর কিছু হতে পারে না। কারা আকবরকে সবচেয়ে বেশি বেগ দিয়েছিল — এই ভুইফোঁড়রা, বা আফগান বিদ্রোহীরা না কি দলছুট পর্তুগিজরা, তা নিয়ে এখনও তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু বাংলায় মুঘল শাসন যে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

যেমন, বাংলায় পারসিক প্রভাব এ সময়ে চরমে ওঠে এবং শিয়া-পারসিক অভিবাসীরা মুসলমান সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরে এক হাজার বছরে — কিছু স্বল্পস্থায়ী ব্যতিক্রম বাদ দিলে — বাংলা কখনও এমন একটা কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন হয়নি, যেমন হল মুঘল আমলে। প্রকৃত অধীনতা অবশ্য এল জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১২-১৩ সালে যখন ইসলাম খান বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে কায়েম করলেন। আরও দুটি বছর বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৩২, যখন শাহজাহান পর্তুগিজদের দমন করলেন। আর ১৬৬৬, যখন শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অবধি মুঘল সাম্রাজ্য প্রসারিত করলেন। এই দুই ঘটনাই ইংরেজ ও ওলন্দাজদের বাংলায় কার্যকলাপ বাড়াতে উৎসাহ দিল। তখন প্রত্যক্ষ তাগিদও ছিল। ইউরোপের নানা যুদ্ধে তখন প্রচুর বারুদ চাই, বারুদ তৈরিতে চাই সোরা। তখনও লাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের উত্থান হয়নি, ইংল্যান্ডে ভারতীয় সূতিবস্ত্রের রমরমা বাজার। আর রেশমি কাপড়ের চাহিদায় তো কখনওই ভাটা পড়ত না। এ ছাড়াও

ছিল অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য, যেমন নীল। বাংলায় এ সব পণ্য সস্তায় মিলত, আর সেখানে রাজনৈতিক স্থিরতাও ছিল। তাই বাংলায় বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক।

বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রচুর পরিমাণে রুপো আমদানি করে চলল এবং তার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে টাকার ব্যবহার দ্রুত বাড়তে লাগল, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও হল রীতিমতো ঈর্ষণীয়। সুলতানরা রাজস্ব হিসেবে জিনিসপত্র বা কড়ি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, কখনও সখনও টঙ্কা। কিন্তু পরের দিকের মুঘল সম্রাট এবং তাঁদের প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা বিপুল সম্পদ বাংলা থেকে তুলে নিয়ে যেতেন, রাজস্ব যেত ক্যারাভান-এ, শকট-এর পর শকট বোঝাই হয়ে। মুর্শিদকুলি খাঁর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তখন আওরংজেবের অর্থের টানাটানি। মুর্শিদকুলি তাঁকে প্রচুর রাজস্ব তুলে দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বিভিন্ন সরকারি পদ কিনে নিয়েছিলেন, যে কৌশলের চরম পরিণতি বাংলার নবাবি, যা তিনি আওরংজেবের মৃত্যুর দশ বছর পরে উপার্জন করেন। বাংলার বিপুল রাজস্ব ইংরেজদেরও প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু সে কথায় যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন আলোচনা করা দরকার — বাঙালিরা ব্যবসাবাণিজ্যে সফল হল না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে। মঙ্গলকাব্যে সদাগরদের অভিযানের কাহিনী আছে — চাঁদ সদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্তদের সফল বাণিজ্যের বিবরণ। স্পষ্টতই মঙ্গলকাব্য রচনার সময় লোকস্মৃতিতে সমুদ্রযাত্রা এবং বাণিজ্যিক ঐতিহ্য বহতা ছিল। কিন্তু এই সব অভিযান কোন সময়ের ঘটনা? মমতাজুর রহমান তরফদার নিশ্চিত বিশ্বাসে বলেছেন যে 'একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রগুলির অবক্ষয়ের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে'। সুতরাং, অনুমান করা যায়, বাংলার এই 'সদাগর'রা ইসলাম-পূর্ব যুগের মানুষ। মনে রাখতে হবে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম যে স্তম্ভগুলির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তার অন্যতম হল বণিক সম্প্রদায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রক্ষণশীল সেন রাজারা এঁদেরই সামাজিক বিন্যাসে নীচে নামিয়েছিলেন। তখন থেকেই বাঙালি মানসে বানিকবৃত্তির একটা অবনমন ঘটল। বণিকের গায়ে নিচু বৃত্তির ছাপ পড়ে গেল। অথচ, ছবিটা পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও বাঙালির জীবনে বাণিজ্যের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার প্রমান রয়েছে।

বাংলার প্রথম দিকের মাড়োয়ারি ও ক্ষত্রীদের আমদানি করেছিলেন মুঘলরা। তাঁরা সম্রাটের নানা অভিযানের খরচ মেটাতে ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ঋণ দিতেন, বিনিময়ে মুঘল শাসকরা তাঁদের নিরাপত্তা দিতেন। ইউরোপীয়দের যখন প্রতিপত্তি হল, তাঁরা উমিচাঁদের মতো উত্তর ভারতের বণিকদের কাজে লাগালেন, বিশেষত মুর্শিদাবাদে। কিন্তু শেঠ, বসাক এবং শীলদের মতো বাঙালি বণিকদের সাহায্যও নিলেন তাঁরা, ব্যবসার অংশীদার করলেন তাঁদের, কিংবা তাঁদের মাধ্যমে ব্যবসার জন্য পণ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন, দাদনি প্রথায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হঠাৎ এই দাদনি প্রথা তুলে দিল, তার বদলে নিজেদের গোমস্তা নিয়োগ করল। গোমস্তরা ছিলেন কোম্পানির মাইনে করা কর্মী। গবেষণা থেকে দেখা যায়, এখানে এই কর্মীদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। পাঠান আমলে তাঁদের সুদিন শুরু হয়, মুঘল আমলে অবস্থা আরও ভালো হয়, এখন তাঁদের প্রতিপত্তি হয় দাঁড়াল অবিসংবাদিত। পরের সব কটি যুগান্তকারী দশকে, ১৭৫৭'তে পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬৫'তে দেওয়ানি সনদ, ১৭৭৪'-এ রেগুলেটিং আইন এবং ১৭৯৩-তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত — এই তিনটি বর্ণ উত্তরোত্তর ব্রিটিশদের অনুকূয়ো ভোগ করল, আর সামনে তো বটেই, এমনকী বাণিজ্যেও বণিক সম্প্রদায় ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ল। ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু তা ব্যতিক্রমই। বাংলায় আজও এই তিন বর্ণের প্রতিপত্তি চলছে, রাজনীতিতে, রাষ্ট্রচালনায়, বিদ্যায়তনে, সংস্কৃতি

জগতে, সর্বত্র। যে কোনও ক্ষেত্রে যাঁরা মাথায় রয়েছেন তাঁদের পদবি এবং উপাধিগুলিতে একবার চোখ বোলান।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঘটনাগুলি বহুচর্চিত, শুধু দু'একটি বিষয়ে আলোচনা করব, যেগুলি বাঙালির বাঙালিত্ব গঠনে কাজ করেছে। জমিদারি থেকে বাংলার সমৃদ্ধি এসেছে, না বিদেশি প্রভুর অপূরণীয় রাজস্যতৃষ্ণা জমিদারকে শুষে নিয়েছে তা নিয়ে আজও তীব্র বিতর্ক চলে। সেই বিতর্ক এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু দুটি ঘটনা লক্ষণীয়। এক, প্রাচীন পরিবারগুলির একটি অংশ সর্বস্বান্ত হলেও অন্য একটি অংশ বিপুল সম্পদের অধীশ্বর ওঠে। দুই, কিছু পরিবার বাণিজ্যেও লক্ষ্মীলাভ করে। বাঙালিবাবুও এই সময় ফুলে ফেঁপে উঠছিলেন, তাঁরা পয়সার জাঁক দেখানোর উপায় খুঁজছিলেন, অযোধ্যার নবাবের কলকাতা আগমন পথ দেখাল। বাঙালির রান্নার মহিমায় তার ভক্তরা চিরকালই আপ্লুত ছিল। ক্রমিক সংস্কৃত্যায়নের ফলে দশম শতাব্দীর নৈষধচরিত বা ফুল্লরার বারোমাস্যায় বর্ণিত হরিণ মাংস, শুকর মাংস ও শিকার-করা-পাখির মাংস এ বার বাঙালি ভদ্রলোকের খাদ্যতালিকা থেকে অন্তর্হিত হল। মুরগি তো এক প্রজন্ম আগেও হিন্দুদের কাছে অশুদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়া রীতিসিদ্ধ করতে দুটি আস্ত পুরাণ লিখতে হল। বাঙালির রান্নায় নতুন দিগন্ত খুলে দিল চৈতন্যের নিরামিষ খাদ্যসম্ভার। মাছ-মাংসের বদলে প্রোটিন-বিকল্প ডাল হয়ে উঠল অত্যাবশ্যক। মাংশাসী বাবুরা দেখলেন পেঁয়াজ-রসুন বর্জিত পাঁঠার জিরে-ঝোলের থেকে বাবুর্চি-খানসামার মশলাদার খাসি অনেক সুস্বাদু। ওই জিরে ঝোল শুধু পবিত্র ভোগের জন্য রইল। সুলতান আর মুঘলদের সঙ্গেই পোলাও বিরিয়ানি, কোর্মা, পরোটা বাংলায় ঢুকেছিল, কিন্তু মুসলিম শাসনের প্রায় শেষ পর্ব পর্যন্ত মুসলমানরাই এসব খেতেন। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিরা মেক্সিকো থেকে আলু আমদানি করল, সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা আর চালকুমড়ো। নির্ভেজাল বাঙালি খানায় দোরমা (আর্মানি), তরকারি (ফার্সি)-র সঙ্গে ফুলকপি-বাঁধাকপি-কড়াইশুঁটি টমাটোর মতো বিলিতি সব্জি সবই ঢুকল। চপ, কাটলেট, ফ্রাই, ওমলেট(মামলেট) আর 'কবিরাজি' কাটলেটও (ডিমের 'কভারেজ' দেওয়া) সাহেবদের আনা। মিষ্টির জন্য বাঙালি রসনা এতটাই ব্যগ্র যে দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরির বিরুদ্ধে 'গোক্ষেত্র'-র নিষেধ তারা গ্রাহ্যই করেনি, আর এই ছানা থেকে বানানো হাজারো মিষ্টি ভারতের অন্য সব অঞ্চলের ক্ষীর-খোওয়ার মিষ্টিকে হারিয়ে দিয়েছে। তবে বাংলার সুপরিচিত মিষ্টান্নের অধিকাংশই গত ১৪০ বছরে সৃষ্ট। সন্দেশ নিঁখুত হল ভীম নাগের হাতে, রসগোল্লা বাগবাজারের নবীনচন্দ্র দাশের কাছে, আর লেডি ক্যানিং-এর উৎসাহে লেডিকেনি ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকে। কে সি দাশের রসমালাই আরও এক প্রজন্ম পরের ঘটনা। সত্যিই, ধন্য বাগবাজার!

লখনউ থেকে ওয়াজিদ আলির সঙ্গে যে বিচিত্র বিনোদন-উপকরণ এসেছিল, কলকাতার নব্য ধনী বাবুরাই তার সব থেকে বড় খদ্দের হয়ে উঠলেন। তবে ঊনবিংশ শতকের বাংলা শুধু যে জমিদার ও বাবুদের ইতিহাস নয়, তা গবেষকরা দেখিয়ে দিয়েছেন। সং আর কবির লড়াই, যাত্রা এবং জাগরণ-পাঁচালি, খেমটা আর ঝুমুর সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করত; বটতলার কাঠখোদাই, ক্রোমো লিথোগ্রাফ, ওলিওগ্রাফ, চোরবাগান প্রিন্ট এবং কালীঘাটের পট দেখে তাদের আনন্দ দিত। দুঃখের বিষয়, হানা নিজকোভা কি উইলিয়াম ও মিলড্রেড আর্চার-এর মতো ইউরোপীয় গবেষকরা এই পট 'পুনরাবিষ্কার' করার আগে পর্যন্ত আমরা এর নান্দনিক মূল্য নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাইনি।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার কারণেই বাঙালির কাছে ঊনবিংশ শতক স্মরণীয়। এর উৎস লুকিয়ে আছে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ইতিবৃত্তে — স্কুল, কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। তবে এর পথ যে সব সময় মসৃণ ছিল তা নয়. ডিরোজিও-অনুগামী 'ইয়ংবেঙ্গল'দের আন্দোলন আর

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কুলীনদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ বাঙালি সমাজে রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল, বোধহয় বেন্টিঙ্ক-রামমোহনের সংস্কারের থেকে বেশিই। পশ্চিমী শিক্ষার খরচ ও লাভের অনুপাত হিন্দুদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, আর মুসলিমরা মোটের উপর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পথেই গেল, যার ফল তাদের ইতিহাস থেকেই পরিষ্কার। মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে শাসনকর্তৃত্ব হস্তান্তর, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উদ্যোগ, আর অবশ্যই রেনেসাঁস এই যুগের প্রধান প্রধান ঘটনা। এর সঙ্গেই ঘটেছিল পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান কেরানিকরণ —যে প্রবণতা এই শতকের নব্বই দশক পর্যন্ত অব্যাহত। গত শতকের শেষ দিকেই ভারতের অতীত ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্ত প্রকল্পটির জন্ম। এই সময়েই বাঙালি হিন্দুর কাছে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের ধারণা গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের লেখায় বাঙালিত্বের প্রকাশ বিস্ময়কর উচ্চতায় পৌঁছল, বাংলার রঙ্গমঞ্চ সবাইকে সম্মোহিত করে ফেলল। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করলেন — এই পর্বেই তার শীর্ষবিন্দু। বিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত প্রতাপের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কৌশলও আয়ত্ত করল বাঙালিরা। এই বিরোধ-বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল দুইই হয়ে দাঁড়াল বঙ্গভঙ্গ। বোঝাই যাচ্ছিল, বাংলার সঙ্গে ব্রিটেনের সুখসম্পর্কের দিন শেষ হয়ে আসছে। যা হওয়ার তা-ই হল —ওড়িশা-অসমের পৃথকীকরণ আর রাজধানী স্থানান্তর (১৯১১)। আহত হলেও সেই মুহূর্তে বাঙালিদের পক্ষে এই আঘাতের সম্পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না, কারণ আরও কিছুদিন নেতৃত্বের রাশ ছিল কলকাতা তথা বাংলারই হাতে।

বাংলার প্রতি বঞ্চনা করা হচ্ছে, এই মনোভাব এই সময় থেকেই বাঙালির মনে দৃঢ়মূল হতে শুরু করল। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে বাঙালি স্বত্তার প্রকাশ ঘটল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ রূপে। দৃশ্যকলায় নন্দলাল ও দুই ঠাকুর (অবন ও গগন) আর তাঁদের 'বেঙ্গল স্কুল' কোম্পানির চিত্রকর আর তাদের উত্তরসূরিদের ছাপিয়ে গেল। পাশাপাশি যামিনী রায় লোককলায় আশ্রয় খুঁজলেন, হেমেন মজুমদার, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় আর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজেদের আলাদা আলাদা জায়গা করে নিলেন। রামকিঙ্করের বিশাল আকারের ভাস্কর্যে বাঙালি অভিভূত হল, আনন্দ কুমারস্বামীর অনুপ্রেরণায় নতুন নৃত্যকলায় বিস্ময় জাগালেন উদয়শঙ্কর। রবীন্দ্রসংগীতে মজে রইল সারা দেশ, আর বাংলায় কোনও ধ্রুপদী নৃত্যধারার সন্ধান না মিললেও (মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক চেষ্টা সত্ত্বেও) রবীন্দ্রনাথ জাভা ও বলিদ্বীপের নাচ থেকে একটি ধারা নিয়ে এলেন। বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ শুধু যে সাহিত্যে ও শিল্পে প্রভাসিত হয়েছিল তা নয়। যে ফুটবল বিবেকানন্দেরও ভাল লেগেছিল, তা মানুষকে মাতিয়ে দিল — বিশেষ করে যখন খালি পায়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা গোরাদেরই হারাল। চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিলেন — ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষের পরাজয় বাঙালির 'বঞ্চনা'র তত্ত্ব আবার প্রমাণ করল। পরে সুভাষ আর তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ বাঙালির একমাত্র অভাব পূর্ণ করল — রোম্যান্টিক সমরনায়ক পরিণত হলেন তাৎক্ষণিক প্রতীকে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে ১৮৭২-এর জনগণনার ইঙ্গিতই প্রমাণিত হল: বাংলা মূলত একটি মুসলিম রাজ্য। যে হিন্দু জমিদার ও ভদ্রলোকেরা জনগণনার রিপোর্ট অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করেছিলেন, তাঁরা এ বার কঠিন বাস্তবের স্বাদ পেলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ একাধিপত্যের দিনে যাঁরা সামাজিক ভাবে একগুঁয়েমি দেখিয়েছেন সমভাষী মানুষদের ক্ষেত্রে ('আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান'), আজ আর তাঁদের কিছু বলার রইল না। পূর্ব বঙ্গের অভিজাতদের কলকাতায় চলে আসার সুযোগ ছিল, কিন্তু সাধারণ হিন্দুদের কাছে মুসলমানদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার নবোদ্যম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। তাই ফজলুল হকের ভাষণ আর সুরাবর্দির সাম্প্রদায়িক

আগুন নিয়ে খেলার মধ্যেই দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হল বাংলা, ১৯৪২-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরে পরেই। এই সব মারাত্মক ঘটনা আর পরবর্তী রক্তপাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্যও সংহত, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি সত্তার দূরকল্পনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এল দেশভাগ। নতুন যুগের সঙ্গে দেখা দিল নতুন পরিচয় 'উদ্বাস্তু'. অজস্র বুকভাঙা কাহিনী আর দুর্বিসহ দুর্ভোগ সূচিত হল, বাঙাল-ঘটি দ্বন্দ্ব প্রায় প্রবাদ হয়ে উঠল। এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে উভয় বঙ্গের যে উন্নয়ন ঘটল — এত সবের লাভ বোধহয় সেইটুকুই। দুটি ধর্মকে কেন্দ্র করে বাঙালি সত্তার এই বিভাজনে এখনও সেতুবন্ধন সম্ভব হয় নি — ১৯৭১-এ 'ওপার বাংলা' রক্ত দিয়ে বাঙালি হওয়ার দাম মেটানোর পরেও নয়। শামসুর রহমান, শামসুল হক, কবির চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অবশ্য নৈরাশ্যবাদীদের ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন। বাঙালি সত্তা ও দেশে কিছু কম জীবন্ত নয়।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বাঙালির ইতিবৃত্ত শেষ করার আগে একটি প্রবণতা বিবেচনা করা যেতে পারে। ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের গোড়ায় নকশাল অভ্যুত্থান ব্রিটিশ-উত্তর বাংলার চেহারা বদলে দিল। অধিকাংশের কাছেই জীবন হয়ে উঠল (হব্সের ভাষায়), 'একক, দরিদ্র, জঘন্য, জান্তব এবং সংক্ষিপ্ত'। বেকারি ও দারিদ্রের সঙ্গে যে হতাশা এল তা সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকারদের নজর এড়ায়নি। 'কেরানি-উৎপাদক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' থেকে বেরিয়ে চাকরির ক্রমক্ষীয়মাণ সম্ভাবনা আর 'ইন্টারভিউ'র অর্থহীনতা 'জন অরণ্য', 'ইন্টারভিউ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে দেখানো হল, ব্যঙ্গ করা হল 'কোরাস'-এ। কিন্তু সমাধান কোথায়? বন্দুকও তো ব্যর্থ হয়েছে, এ বার? এ বার বাঁচতে হবে, যে কোনও মূল্যে। নতুন প্রজন্ম প্রথমেই 'বাঁচতে' শিখল, কারণ 'ব্যবস্থা' ভেঙে পড়েছে, মূল্যবোধ শেখানোর ক্ষমতা আর তার হাতে নেই। ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ, মালপত্র সরবরাহে নামল অনেকেই — 'ফাস্ট ফুড'-এর দোকান, হকারি, ছোট কন্ট্রাক্টরের কাজ থেকে শুরু করে জমি-বাড়ির ব্যবসা। আরও একটু ঝুঁকি নেওয়ার সাহস আছে যাদের, তারা 'তোলা আদায়' থেকে 'প্রটেকশন রেকেট' গড়ায় রক্তের স্বাদ নিতে পিছপা হয় না। পরিবহণও কম আকর্ষণীয় নয়। বস্তুত বাঙালিরা কিছু কিছু ক্ষেত্র থেকে অন্যদের সরিয়েও দিয়েছে। এই শ্রেণীর বেপরোয়া মনোভাব — সমরেশ বসু 'বিবর' উপন্যাসে বোধহয় প্রথম এদের চিত্রিত করেন, আজকের রাস্তায় মিনিবাসের দৃক্পাতহীন চলাচলে যা নিতান্তই স্পষ্ট — ধীরগতি টুং টুং ঘন্টার ট্রামের নিশ্চিন্ত-নির্ভর শান্ত জগৎকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। প্রথম প্রজন্মের সব শিল্পোদ্যোগীই এই শ্রেণীর — যাকে আমরা 'লুম্পেন বুর্জোয়া' বলতে পারি — এ কথা ধরে নেওয়া নিশ্চয়ই ঠিক নয়। কিন্তু সাধারণ বাঙালি এখনও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, এই 'লুম্পেন'দের ন্যায়নীতিহীনতা তাকে রীতিমতো আঘাত করে। এক শ্রেণীর মধ্যবিত্তের 'দ্রুত পয়সা করা'র প্রবণতাও সব সময় আমাদের কাছে নিন্দিত।তবে আর বেশি দিনের জন্য নয়।  ভোগবাদ গ্রাস করেছে সারা পৃথিবীকে। অর্থেন বিনিময়ে পরিষেবা সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক আমূল বদলে দিয়েছে। 'সাতটা বাজে, পড়তে বস' শুনে যে সমাজে আমাদের বেড়ে ওঠা, তার আনুগত্য ও মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের কাছে অর্থহীন। তাদের লক্ষ্য একমুখী — 'জিততেই হবে'। বাংলার চিরচেনা দারিদ্র ('হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান' — নজরুল নয়, নোবেল পেয়েছেন অমর্ত্য সেন) এই প্রজন্মের বড় শত্রু, 'সরল জীবন, উচ্চ চিন্তা'র আদর্শ তাদের পরিকল্পনার মধ্যে কোনও ভাবেই খাপ খায় না। 'খবর' তাদের কাছে ধোঁয়াওঠা চায়ের কাপ নিয়ে আয়েস করে দেখার জিনিস নয়, তাসের প্যাকেট শাফল করার মতো দ্রুত পটপরিবর্তনই কাম্য, তার মধ্যে অল্প পরে পরেই ঠাসা থাকবে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের চটুল সম্ভার। বিভিন্ন চ্যানেলে অজস্র হিন্দি সিনেমা — বাংলা বই পড়ার সময় তারা পাবে কোথা থেকে?

নতুন শতকের দোরগোড়ায় একটা কথাই মনে হচ্ছে। আগামী দশকগুলি কার হবে, ওদের, না আমাদের? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, নানা পালা বদলের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি চরিত্র সব সময়েই কিন্তু কিছু

মূল্যবোধ আঁকড়ে রেখেছিল — এবং টিকে গিয়েছিল। স্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগী আর 'লুম্পেন বুর্জোয়া'রা সফল হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, বাঙালিদের সব সময় 'মালিক' দরকার, বাঙালিরা বড্ড প্রতিবাদ করে — এ সব মিথ আজ মিথ্যা। এ জন্য তাদের নিশ্চয়ই ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিন্তু এরা যখন হাসি মুখে হার স্বীকার করতে নারাজ হয়, তখন আমাদের সমাজের ভাবমূর্তি নিয়ে সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়ি. ইডেন গার্ডেনস থেকে এই শ্রেণীর মানুষের অপকীর্তি সাম্প্রতিক অতীতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে বার বার প্রচারিত হয়েছে। তা হলে এরাই কি আগামী দিনে বাঙালি সত্তার প্রতিভূ হয়ে উঠবে? হয়তো নয়। এই ওয়াইটুকে প্রজন্মে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী শিকদার আর দিব্যেন্দু বাড়ুয়ারাও আছে। আছে অগণিত বাঙালি কিশোর-কিশোরী যারা এখনও গোগ্রাসে ফেলুদা আর কাকাবাবু সিরিজ পড়ে।